ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথকতা-কবিগান

প্রাচীন রাজন্যবর্গের অনেকেই ছিলেন ইতিহাস-বিমুখ। তাঁরা ইতিহাস-চর্চার পরিবর্তে কথকতা-কবিগানের মধ্য দিয়ে বিনোদনের রস অনুভব করতেন। রাজপ্রশস্তি গেয়ে সংসার নির্বাহ করতেন অনেক কবিই। তাই কথকতা-কবিগানের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছিল।

অন্য দিকে, নদীতীরবর্তী জনপদ হলেও, টাঙন-পারের জমি ছিল এক-ফসলি। এখানকার বেশির ভাগ এলাকায় আজও বছরে এক বার মাত্র ফসল ফলে। বর্ষার মরশুমে ধান রোপণের পর কৃষকেরা দীর্ঘ অবসর পান। তাই ভাদ্র মাসে তাঁদের অবসরযাপন। আসর বসান কথকতা ও কবিগানের ।

কথকতা :

ইতিহাসের ঘটনাবলি বংশপরম্পরায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্রোতস্বী ছিল। এইসব ঘটনাই কালক্রমে কথকতায় পরিণত হয়। তবে লোকায়ত কাহিনি ও রূপকথার কাহিনিও কথকতার খোরাক। গল্পকথক কখনও কখনও কল্পনার আলোয় রাঙিয়ে নিয়ে আত্মজীবনীমূলক কাহিনিও পরিবেশন করেন। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বরচিত কথা ও সুরে গানও পরিবেশন করেন কোনও কোনও কথক।

পাড়াগাঁয়ের শ্রোতারা এইসব কথন মন্ত্রমুগ্ধের মতো গেলেন। একটি গল্পেই কয়েক রাত পেরিয়ে যায়। কাহিনির বাঁধন ও পরিশেনার চমৎকারিত্বে এই গল্পগুলি এখনকার অনেক মেগাসিরিয়ালকেও হার মানাবে। শ্রোতারা চোখের সামনে উটি, কোবালম, জুহু বা সুইজারল্যান্ডের দৃশ্য দেখতে না পেলেও গল্পের চরিত্র ও প্রেক্ষাপট যেন তাঁদের সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

লণ্ঠনের আলোতেই এই অনুষ্ঠান চলে। বাড়িতে আসর বসলে কথকের জন্য ভালো খাবারের বন্দোবস্ত হয়। চিতাই পিঠে, আসকা পিঠে, তালপিঠে, তালবড়া আর দুধ-খেজুরগুড় দিয়ে বানানো পায়েস। সামর্থ্য থাকলে হাঁসের মাংস।

আয়োজক-বাড়ির চাঁদোয়ার নীচে গল্পকথন শুনতে জড়ো হন ছোটো-বড় সবাই। গৃহবধূরাও রাত জেগে গল্প শোনেন। তাঁরা আবার সন্তানদের কাছে এইসব গল্প শোনান।

কথকতার মধ্যে বাণিজ্যতরী, সওদাগর প্রভৃতি প্রসঙ্গ উঠে আসে। টাঙন নদীর উপর দিয়ে একসময় ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এ বিষয়ও ফুটে ওঠে কথনের মধ্য দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রেই এইসব কাহিনি অতিকথনে ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু উপস্থাপনার গুণে তা অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

পরাক্রমশালী রাজাদের বীরত্ব, যুদ্ধজয় আর রাজবাড়ির গোপন কিস্‌সা এইসব কথনের সিংহভাগ দখল করে আছে। শ্রোতারাও রাজবাড়ির হাঁড়ির

খবর শুনতে পছন্দ করেন। ইতিহাসের আণুবীক্ষণিক সূত্রকে হাতিয়ার করে গল্পকথকেরা কল্পলোকে নিয়ে যান চরিত্রগুলিকে। আর তা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন শ্রোতৃবৃন্দ।

বাড়ির কর্তা মাছের মুড়োটা খাবেন— এটাই সংস্কার। এক রাজপরিবারের রানি তাঁর প্রণয়ীকে গোপনে মাছের মুড়ো খাওয়ান। খাওয়ার পরে রাজবাড়ির গোপন ঘরে বা সিন্দুকে গোপনে বন্দি করে রাখতেন প্রণয়ীকে। পরে রাজার পাতে ঝোলে-চুবানো ওই মুড়োটিই দিতেন রানি। এর প্রেক্ষিতে গল্প কথকেরা বলে থাকেন—

"রাজামশাই ভালই ছিল,
মাছটি খেয়ে জাতটি গেল।"

এই অণু-ছড়াটি গ্রামাঞ্চলে অবৈধ প্রণয়ের ক্ষেত্রে প্রবাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

নানা ধরনের গল্পের প্লট কথকদের মুখে ঘোরাফেরা করে। টাঙন-তীরের গ্রামের সাধারণ ছেলে রাজপরিবারের সান্নিধ্যে এসে বড় হয়ে রাজসিংহাসনে বসেন। হোসেন শাহের সঙ্গে তাঁকে তুলনা করে কথন-কলেবর বাড়ানো হয়। অনেক সময় বিখ্যাত (কুখ্যাত) চোর বা ডাকাতের কাহিনি শোনান কথকেরা। এইসব এলাকায় ডাকাতেরা নিয়ম-মেনে কালীপুজো করে ডাকাতি করত গৃহস্থের বাড়িতে। নারীদের তারা অসম্মান করত না। কোনও ডাকাত এই রীতি-বিরোধী আচরণ করলে দলের কাছে কঠোর শাস্তি পেত। এমন-কী মৃত্যুদণ্ডও হত। ডাকাতির সময় গৃহস্থের বাড়ির তুলসীতলায় ধূপচি জ্বালিয়ে রাখত ডাকাতেরা। কিন্তু বাড়ির কেউ যদি ওই ধূপচিতে লাথি মেরে ভেঙে

ফেলতেন তবে ডাকাতেরা লুঠতরাজ বন্ধ রেখে বেরিয়ে আসত। কোনও প্রতিবাদ করা চলত না। অনেক ক্ষেত্রে অসহায় ও দরিদ্র গৃহস্থকে ডাকাতেরা তাদের অন্যত্র লুঠ করা সম্পদ দিয়ে যেত।

টাঙন-তীরের বিখ্যাত কথকতা চোর-চক্রবর্তী। নানা জায়গায় গৃহস্থের চোখে ধুলো দিয়ে চুরি করে এই চোর। কথকেরা বলেন, রাসবিহারী বসু যেমন পুলিশের জালে ধরা পড়েনি, তেমনই চোর-চক্রবর্তী ধরা পড়ে না।

নাগকন্যা, রাক্ষস-খোক্ষস, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী প্রভৃতি গল্পও কথনের কাঠামো পেয়েছে। নাগকন্যা কাহিনিতে নাগিনী রানি ঘুমের ঘোরে রাজাকে দংশন করতে যান। রাজপুত্র পালঙ্কের নীচে থেকে লক্ষ করেন, রানির নাক দিয়ে সাপ বেরিয়ে আসছে। রাজপুত্র তরবারির কোপে সাপকে কেটে ফেলেন। রানির স্তনে রক্ত লেগে যায়। রাজপুত্র জিভে কাপড় বেঁধে ওই রক্ত মুছে দিতে গেলে রানি জেগে যান। রানির চিৎকারে রাজা বিষয়টি বিবেচনা না-করেই পুত্রকে বনবাসে পাঠান।

রাক্ষসের মৃত্যুরহস্য জেনে রাজকন্যা উদ্ধার এখানকার একটি জনপ্রিয় কথন। পক্ষীরাজ-ঘোড়া রাজকন্যার খোঁজে আকাশ দিয়ে ওড়েন, শিকারে গিয়ে পথ-হারানো রাজপুত্র পরির দেখা পান, রাজপুত্তুর কখনও ঘোড়ায় চেপে তেপান্তরের মাঠ পেরোন, কখনও রাজকন্যাকে চুরি করে পাহাড়ের গুহায় কিংবা ঘন অরণ্যে লুকিয়ে থাকেন- এসব কল্পকাহিনি এখানকার কথকদের মুখে মুখে ঘোরে।

আইহোর রমেশ হালদারের বাড়িতে নিয়মিত কথকতার আসর বসত। মদনাবতীর বৃদ্ধ যামিনী বর্মন এখনও 'মাধবকুমার', 'সীতাহরণ', 'কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ', 'তাজ্জব মূল্য', 'উলঙ্গ বাহার' প্রভৃতি কথন শুনিয়ে রাতের পর রাত পার করে দেন। তাঁর 'মাধবকুমার' কাহিনির সঙ্গীতময় সংলাপের একটি অংশ—

"মাধব : শোনো সুন্দরী, যাচ্ছ কোথায়?
সুন্দরী : আমি যাচ্ছি বনফুল তুলতে—
তোমার চরণ সেবিতে।"[১]

বারো মাইলের জয়দেব বর্মন স্বরচিত কথন পরিবেশন করেন। নালাগোলার ফণিভূষণ চক্রবর্তী ও মণীন্দ্রনাথ সরকার কথকতা পরিবেশন করে অনেকের মনে জায়গা করে নিয়েছেন। গ্রামের অনেকেরই অনেক রাত মণিবাবুর গল্পের সান্নিধ্যে কেটেছে। পঞ্চান্ন বছর ধরে তিনি গল্পকথনের মাধ্যমে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করেছেন। তাঁর 'বউয়ের গুণের কথা' কথন-সঙ্গীতটি গ্রামের সবার মুখে মুখে ঘোরে। তাঁর "মুণ্ডুকাটা কালী আছে বাবা দেউড়িয়াতে"[২] অন্যতম জনপ্রিয় কথনসঙ্গীত।

কথনশিল্পীদের অবশ্য একটাই প্রত্যাশা— গল্প বলার রাত ফিরে আসুক। টিভি-সিনেমার অনেক গল্পই স্বাভাবিক রুচির পরিপন্থী। কিন্তু কথক-পরিবেশিত গল্প শ্রোতাদের ভাবতে শেখায় বলে তাঁদের দাবি। লুপ্তপ্রায় এই কথনশিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা এখানকার কথনশিল্পীদের চোখে-মুখে। লোকসংস্কৃতির অনুষ্ঠানের মঞ্চে এঁদের আহ্বান করা হয় না।

কবিগান :

কথকতার পাশাপাশি কবিগানের চর্চাও টাঙন-তীরে অপ্রতুল নয়। প্রকৃতিদত্ত প্রতিভার উপর ভর করে উপস্থিত বুদ্ধিচাতুর্যের সহায়তায় বাংলা জুড়ে খ্যাতি বিস্তার করেছেন এখানকার কয়েকজন কবিয়াল।

এক সময় পৃষ্ঠপোষকদের সৌজন্যে কবিগানের আসর বসত। এলাকার জমিদার ও প্রভাবশালী ধনীরা এর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পুজোপার্বণ বা সামাজিক কোনও অনুষ্ঠানে কবিগানের চল ছিল। বিশ শতকের শুরু থেকে এই গান সর্বজনীন আসর পেতে থাকে। এখন পৃষ্ঠপোষকদের অভাব। বেশির ভাগ সর্বজনীন অনুষ্ঠানে কবিগান ব্রাত্য।

আগে দুটি দলে উপস্থিত বুদ্ধির প্রতিযোগিতা চলত। তাৎক্ষণিক সঙ্গীতসৃজন করে একই সঙ্গে পরিবেশন করা হত। খালি গলায় পরিবেশিত এই গান শুনতে অজস্র শ্রোতা ভিড় করতেন। অ-মাইক পরিবেশনার জন্য সুর বাঁধা থাকত উচ্চগ্রামে। উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক এই গানে ঢোলকের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সঙ্গে কাঁসর বাজে অনাদত্ত আওয়াজে।

আজকাল একই দলে দুজন তরজা-গায়ক অর্থাৎ কবিয়াল থাকেন। তাঁরাই দুটি দলে বিভাজিত হয়ে কবিগান পরিবেশন করেন। ষাঁড়ের লড়াইয়ের মতো কবির লড়াই এখন আর নেই। অনেক ক্ষেত্রে ঢোল না-বাজলে বোঝাই যায় না যে কবিগান চলছে।

কবিগান প্রসঙ্গে গবেষক ড. দীনেশচন্দ্র সিংহ বলেন, "কবিগান যেন ইক্ষুদণ্ড বিশেষ। কঠিন আবরণের মাঝে সুমিষ্ট রসের অবস্থান।"[৩] গদ্যভাবাপন্ন কবিগানকে রসোত্তীর্ণ করে তোলেন দোহারেরা। তবে একসময় কবিগানে পৌরাণিক আখ্যানের সীমা ছাড়িয়ে অমার্জিত ও অশ্লীল ইঙ্গিতপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি পরিবেশিত হতো। 'রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তরে একদলের পর অপর দল গান করিত। যে দল সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত তাহাদেরই জয় হইত। এই সকল উত্তর-প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিকী আখ্যায়িকা পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদিগের ওপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি কুৎসিত, অভদ্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপূর্ণ থাকিত। অনেক সময় যাহার এইরূপ ব্যঙ্গোক্তির মাত্রা যত অধিক হইত সে-ই তত অধিক পরিমাণে লোকের চিত্তরঞ্জন করিতে পারিত"।[৪]

টাঙন-তীরবর্তী অঞ্চলের কবিয়ালেরা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। গাজোলের রানিগঞ্জের হারানচন্দ্র দাস, পুরাতন মালদহের সাহাপুরের হরেন্দ্রনাথ সরকার, হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডীর প্রহ্লাদচন্দ্র সিংহ ও ঝড়ু সরকার, হবিবপুরের শোলাভাঙা গ্রামের ভাদু সরকার, গাজোলের কাটিকান্দর গ্রামের মদনমোহন মজুমদার প্রমুখ বিখ্যাত কবিয়াল। এঁদের অনেকেই প্রয়াত হয়েছেন।

গাজোলের চাকনগর এলাকার অমূল্য হালদার (সরকার) একজন খ্যাতনামা কবিয়াল। তিনি অনেকটা ঈশ্বর গুপ্তের মতো ভাবনা নিয়ে কবিগানের

আঙ্গিককে বাঁচিয়ে রাখার সাংগঠনিক চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। জেলায় তো বটেই, জেলার বাইরে, এমন-কী রাজ্যের বাইরেও কবিগান পরিবেশন করেছেন তিনি। কৃষিকাজের পাশাপাশি কবিগানেও তিনি সন্তোষজনক উপার্জন করেন। তাঁর গানে সাধারণত রাজনীতির বিষয় থাকে না। কিছু বিষয় তাঁরা আগাম মহড়া দিয়ে রাখেন। বাকিটা মঞ্চে তাৎক্ষণিক ভাবে উপস্থাপন করেন। আধ্যাত্মিক বিষয় ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সমসাময়িক অরাজনৈতিক বিষয় তাঁর গানে কলেবর লাভ করে। তাঁর মতে, "শুধু বৈদ্যুতিন গণমাধ্যম নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে কবিগানের অস্তিত্বই লুপ্ত হতে বসেছে।"[৫] তাঁর লেখা একটি আধ্যাত্মিক বিষয়ক গানের সংক্ষিপ্ত রূপ —

"চুল দাড়ি রাখলে যদি হরি মেলে, ছাগ না রহিত দেশে;
সাধনে তৎপর নাহি অবসর, দাড়ি রাখে বিনা হুঁশে।
নিষ্কাম হলে যদি হরি মেলে বলদ না রহিত ভবে,
কামে হয়ে কামী তবে হবে নিষ্কামী সেই সে যে-ধামে যাবে।
মোটামালা গলে তিলক কাটিলে যদি হরি পাওয়া যায় —
গৌরাঙ্গলীলায় তিলকমালা পেয়েছিল গর্দভকায়।
বিচার করিয়ে দেখনা শরীরে সেই সে যে কাজ চাবে,
সেই যে গাধা ভেকাশ্রিত সেই যাবে কি ব্রজে?
নামটি আমার অমূল্য সরকার মালদা জেলায় বাড়ি —
দেশ বিদেশে করে থাকি কবির লড়ালড়ি।"[৬]

গাজোলের শংকরপুর গ্রামের অনন্ত মালাকার আর এক প্রখ্যাত কবিয়াল। তিনিও পূর্ববঙ্গ থেকে এসেছেন। প্রথমে পাল্লাদার হিসাবে তিনি অমূল্য হালদার, শরৎচন্দ্র সরকার, জগদীশচন্দ্র সরকার ও সহদেব সরকারের সঙ্গে কাজ করেছেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা ও রাজনৈতিক বিষয়েও তিনি কবিগান পরিবেশন করেন। সিপাহি বিদ্রোহের দেড় শো বছর পূর্তিতে তিনি একটি দীর্ঘ গান রচনা করে প্রশংসা লাভ করেছেন। তাঁর লেখা একটি গানের তৃতীয় অন্তরা —

"বড় বড় মার্চেন্ট দিয়ে ধর্মের সুড়সুড়ি
অল্পদিনে কাজ বাগিয়ে করে নিলো বাড়ি-গাড়ি।
এক কোম্পানি যায় এক পথে আমরা চলি কোনও মতে
সনাতন ধর্ম জগতে পড়ছে তায় জলাঞ্জলি।"[৭]

কাটিকান্দর গ্রামের মদনমোহন মজুমদার রাজ্যের বাইরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও অসমের বিভিন্ন জায়গায় কবিগান পরিবেশন করে সুনাম অর্জন করেছেন। গানের কথায় বিভিন্ন বিষয়কে তিনি ব্যবহার করেন। তাঁর একটি গানের দ্বিতীয় অন্তরা—

"দয়াল তোমার দয়ায় পাইয়া সাধন মানবতরীকল
বিনা বন্ডে পরের ল্যান্ডে জনম ভরে দিলাম জল।
লেগে কাম-কামনার জলের ছোঁয়া
তরীকল মোর গেছে খোয়া।"[৮]

বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের দাপটে ও সংক্ষণের অভাবে এই জনপদের কবিগানের চল ক্রমশ মিইয়ে যাচ্ছে। লোকায়ত এই সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা দরকার। এ জন্য স্থানীয় সংস্কৃতিমনস্ক শিক্ষক-গবেষকদের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগকেও আরও শক্তিশালী করতে হবে। নইলে যুগের হাওয়ায় কবিগানের ধারা লুপ্ত হতে হতে চিরসুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. যামিনী বর্মন, মদনাবতী, নালাগোলা, মালদহ-এর কাছে শ্রুত, ০২/০২/২০০৪

২. মণীন্দ্রনাথ সরকার, নালাগোলা, মালদহ-এর কাছে শ্রুত, ০৩/০২/২০০৪

৩. একালের ধৃতি (কবিগান) ৪র্থ সংখ্যা. জানুয়ারি ২০০৫, সম্পাদনা: সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত, প্রকাশনা: কল্যাণগড়, উত্তর চব্বিশ পরগনা পৃষ্ঠা-০৫

৪. রামতনু লাহিড়ি ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ — শিবনাথ শাস্ত্রী। সম্পাদনা বারিদবরণ ঘোষ, জানুয়ারি ২০০৭, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯ পৃষ্ঠা-৩৭

৫. অমূল্য হালদার (সরকার), চাকনগর, গাজোল, মালদহ-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ ০৮/১০/২০০৮

৬. কবির কাছ থেকে সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি

৭. একালের ধৃতি (কবিগান) ৪র্থ সংখ্যা. জানুয়ারি ২০০৫, সম্পাদনা: সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত, প্রকাশনা: কল্যাণগড়, উত্তর চব্বিশ পরগনা পৃষ্ঠা-৯০

৮. একালের ধৃতি (কবিগান) ৪র্থ সংখ্যা. জানুয়ারি ২০০৫, সম্পাদনা: সুধীরঞ্জন দাশগুপ্ত ও জহর সেনগুপ্ত, প্রকাশনা: কল্যাণগড়, উত্তর চব্বিশ পরগনা পৃষ্ঠা-৮৮